চতুর্থ অধ্যায়

শাস্ত্রের ক্ষমতা

(The Authority of Scripture)

ক) শাস্ত্রের সকল কথা ঈশ্বরের কথা

১। শাস্ত্র নিজে এই দাবী করে

২। বাইবেল পাঠের দ্বারা বাইবেলের এই দাবী সম্বন্ধে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে

৩। অন্যান্য সাক্ষ্য যদিও প্রয়োজনীয়, কিন্তু চূড়ান্ত নয়

৪। ঈশ্বরের বাক্য আত্ম-সাক্ষ্য দেয়

৫। এর অর্থ এই নয় যে, ঈশ্বরের কাছ থেকে শ্রুতিলিপি একমাত্র যোগাযোগের উপায়

খ) অতএব, শাস্ত্রের কোনও কথার প্রতি অবিশ্বাস বা অবাধ্যতা, ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস বা অবাধ্যতার সমান

গ) শাস্ত্রের সত্যতা

১। ঈশ্বর মিথ্যা কথা বলতে পারেন না

২। অতএব, শাস্ত্রের সকল বাক্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সর্বাংশে নির্ভুল

৩। ঈশ্বরের বাক্য সত্যের চরম মান

৪। নতুন কোন সত্য কি শাস্ত্রের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারে?

ঘ) লিখিত শাস্ত্র বাক্য আমাদের চূড়ান্ত ক্ষমতার বিষয়

আগের অধ্যায়ে আমরা কোন্ লেখনী বাইবেলের অন্তর্গত এবং কোন্‌টি নয়, সে বিষয়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু যখন বাইবেল কী, তা আমরা জেনেছি, তখন এর পরবর্তী ধাপে আমাদের দেখতে হবে বাইবেল নিজের সম্বন্ধে আমাদের কী শিক্ষা দেয়। অর্থাৎ, বাইবেলের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব।

বাইবেল নিজের বিষয় যে সমস্ত শিক্ষা দেয়, সেগুলিকে সাধারণ ভাবে চার ভাগে ভাগ করা যায় : ক্ষমতা *(Authority)*, স্বচ্ছতা *(Clarity)*, প্রয়োজনীয়তা *(Necessity)*, এবং যথেষ্ঠতা *(Sufficiency)*। এই অধ্যায়ে আমরা বাইবেলের ক্ষমতা সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করব।

সংজ্ঞা: শাস্ত্রের ক্ষমতা বলতে আমরা বুঝি— **শাস্ত্রের সকল কথাই এমনভাবে ঈশ্বরের কথা যে, শাস্ত্রের কোনও কথার প্রতি অবিশ্বাস বা অবাধ্যতা ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস বা অবাধ্যতার নামান্তর**।

ক) শাস্ত্রের সকল কথাই ঈশ্বরের কথা

১। শাস্ত্র নিজে এই দাবী করে

শাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানে বার বার এই দাবী করা হয়েছে। পুরাতন নিয়মে বার বার ***"সদাপ্রভু এই কথা কহেন,"*** এই কথার দ্বারা এই দাবী করা হয়েছে। পুরাতন নিয়মের সময় প্রজাদের প্রতি রাজার আজ্ঞাকে একই প্রকার বিবৃতির দ্বারা প্রকাশ করা হত। *"রাজা এই কথা কহেন . . . ,"* এমন বিবৃতির দ্বারা রাজার যে আজ্ঞা প্রজাদের কাছে উপস্থিত হত, প্রজারা সেই আজ্ঞার সত্যতার বিষয় প্রশ্ন করতে পারত না বা তার অবাধ্য হতে পারত না। একইভাবে, ইস্রায়েলের ভাববাদীদের দ্বারা ***"সদাপ্রভু এই কথা***

কহেন," এইরূপ বিবৃতি ইস্রায়েলের রাজা সদাপ্রভুর আজ্ঞা হওয়ায়, তা চরম ক্ষমতার অধিকারী ছিল। আবার, ভাববাদীরা যখন এইভাবে কথা বলতেন, তখন তাদের সকল কথাই ঈশ্বরের কাছ থেকে লাভ করতে হত, তা না হলে তারা মিথ্যা ভাববাদীরূপে পরিগণিত হত (গণনা ২২:৩৮; ২বিবরণ ১৮:১৮-২০; যিরমিয় ১:৯, ১৪:১৪, ২৩: ১৬-২২, ২৯:৩১-৩২; যিহিষ্কেল ২:৭, ১৩:১-১৬)।

আবার অনেক স্থানে, ঈশ্বর ভাববাদীদের মাধ্যমে কথা বলেছেন (১রাজা ১৪:১৮, ১৬:১২, ৩৪; ২রাজা ৯:৩৬, ৪:২৫; যিরমিয় ৩৭:২; সখরিয় ৭:৭, ১২)। অর্থাৎ, ঈশ্বরের কথাই ভাববাদীরা ঈশ্বরের নামে প্রকাশ করেছে (১রাজা ১৩:২৬ পদের সঙ্গে ২১পদ; ১রাজা ২১:১৯ পদের সঙ্গে ২রাজা ৯:২৫-২৬পদ; হোশেয় ১:১২; ১শমূয়েল ১৫:৩, ১৮)। তাই ভাববাদীর মুখ থেকে উক্ত কথাকে অবিশ্বাস করা বা সেই কথার প্রতি অবাধ্য হওয়া ঈশ্বরকে অবিশ্বাস করা বা ঈশ্বরের অবাধ্য হওয়ার নামান্তর ছিল (২ বিবরণ ১৮:১৯; ১শমূয়েল ১০:৮, ১৩:১৩-১৪, ১৫:৩, ১৯, ২৩; ১রাজা ২০:৩৫, ৩৬)। যদিও এই দাবী অনুসারে শাস্ত্রের সকল কথাকেই ঈশ্বরের বাক্য হিসাবে প্রমাণ করা সম্ভব নয় (কারণ, এমন কথা শাস্ত্রের কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে মাত্র পাওয়া যায়), কিন্তু এই সকল অংশের সামগ্রিক শিক্ষা সমস্ত শাস্ত্রকেই ঈশ্বরের বাক্য হিসাবে দেখায়।

নতুন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে পুরাতন নিয়মের সকল লেখাকেই ঈশ্বরের বাক্য হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। বিশেষত ২তীম ৩:১৬ পদে ***"শাস্ত্র"*** *(En. Scripture, Gk. graphe)* শব্দের দ্বারা সমগ্র পুরাতন নিয়মকে নির্দেশ করা হয়েছে। আবার, এই অধ্যায়ের ১৫পদে পৌল পুরাতন নিয়মকে ***"পবিত্র শাস্ত্র কলাপ"*** *(En. sacred writing)* রূপে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, পৌল এখানে বলেছেন যে, পুরাতন নিয়মের সকল লেখাই ***"ঈশ্বর নিঃশ্বসিত"*** *(Theopneustos)*। ***"ঈশ্বর নিঃশ্বসিত"***কথার অর্থ, ঈশ্বরের নিজের মুখের কথা। তাই, পুরাতন নিয়ম ঈশ্বরের লিখিত বাক্য। অর্থাৎ, যদিও ঈশ্বর বিভিন্ন মানুষকে তাঁর বাক্য লেখার জন্য ব্যবহার করেছেন, ঈশ্বর নিজেই এই সকল কথা বলেছেন।

২পিতর ১:২১ পদেও একই ধরণের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। ২০ পদে ***"শাস্ত্রের বিভিন্ন বাণী"*** সম্বন্ধে বলতে গিয়ে পিতর ২১ পদে এমন কথা বলেছেন, ***"ভাববাণী কখনও মানুষের ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয়নি, কিন্তু মানুষেরা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে ঈশ্বর হতে যা পেয়েছে, তাই বলেছে।"*** এর মানে এই নয় যে, পিতর এখানে মানুষের দ্বারা শাস্ত্র বাক্য লিখিত হবার বিষয়কে অস্বীকার করেছে, কিন্তু এর মানে প্রতিটি ভাববাণীর চূড়ান্ত উৎসস্থল মানুষের সিদ্ধান্ত নয়, কিন্তু ভাববাদীর জীবনে পবিত্র আত্মার কার্য।

একই প্রকার বিবৃতি নতুন নিয়মের অন্যান্য স্থানেও পাওয়া যায়। মথি ১:২২ পদে (যিশাইয় ৭:১৪; মথি ৪:৪; ২বিবরণ ৮:৩)- ***"ঈশ্বরের মুখ নির্গত বাক্য"*** বলতে যীশু লিখিত শাস্ত্র বাক্যকেই নির্দেশ করেছেন। মথি ১৯:৫ পদের কথাকে যীশু আদিপুস্তকের লেখকের কথা নয় (আদি ২: ২৪), কিন্তু ঈশ্বরের কথা হিসাবে প্রকাশ করেছেন। মার্ক ৭:৯-১৩ পদে পুরাতন নিয়মের ঐ কথাকে ***"ঈশ্বরের আজ্ঞা"*** বা ***"ঈশ্বরের কথা"*** বলা হয়েছে। প্রেরিত ১:১৬ পদে গীত ৬৪ ও ১০৩ অধ্যায়ের কথাকে পবিত্র আত্মা দ্বারা পূর্বে দাউদের মুখ দ্বারা কথিত বাক্য হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যান্য অংশ (লূক ১:৭০, ২৪:২৫; যোহন ৫:৪৫-৪৭; প্রেরিত ৩:১৮, ২১, ৪:২৫, ১৩:৪৭, ২৮:২৫; রোমীয় ১:২, ৯: ১৭; ১করি ৯:৮-১০; ইব্রীয় ১:১-২, ৬-৭)।

কিন্তু ২তীম ৩:১৬ পদের ***"শাস্ত্র লিপি"*** শব্দের দ্বারা পৌল যদি শুধুমাত্র পুরাতন নিয়মের লেখাকে নির্দেশ করে থাকেন, এই পদ কীভাবে নতুন নিয়মের প্রতি প্রযোজ্য? এই পদ কি নতুন নিয়মের লেখা সম্বন্ধে কোন কথা বলে? গ্রীক নতুন নিয়মে "*graphe* (শাস্ত্রলিপি)" শব্দটি নতুন নিয়মের লেখকদের কাছে বিশেষ অর্থ বহন করে। নতুন নিয়মে এই শব্দটি প্রায় ৫১বার ব্যবহৃত হয়েছে, এবং প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই শব্দের দ্বারা পুরাতন নিয়মকে নির্দেশ করা হয়েছে। এই শব্দের দ্বারা কখনও শাস্ত্রের *Canon*-এর বাইরের কোনও লেখাকে বা বাক্যকে নির্দেশ করা হয়নি।

কিন্তু নতুন নিয়মের দুটি স্থানে এমন বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, যেখানে নতুন নিয়মকেও পুরাতন নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে "শাস্ত্রলিপি" বলা হয়েছে। প্রথমটি, ২পিতর ৩:১৬ পদ, যেখানে পৌলের লেখা চিঠির অস্তিত্ব স্বীকার করে পিতর এমন কথা বলেছে যে, ঐ সমস্ত চিঠিও "অন্যান্য শাস্ত্রের" ন্যায় সমান মর্যাদার অধিকারী। অর্থাৎ, মণ্ডলীতে খুব প্রথম থেকেই পৌলের লেখা চিঠিগুলি পুরাতন নিয়মের ন্যায় একইভাবে ঈশ্বরের বাক্য হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। দ্বিতীয়টি, ১তীম ৫:১৮ পদ, যেখানে পৌল, লূক ১০:৭ পদে উল্লেখিত যীশুর কথাকে "শাস্ত্র" বলেছে।

এই দুটি অংশ আমাদের কাছে তুলে ধরে যে, নতুন নিয়ম লেখার সময় শাস্ত্র নামে অভিহিত বিশেষ রচনা সামগ্রীর সঙ্গে তখনও সংযোজন ঘটে চলেছিল। তাই ২তীম ৩:১৬ পদে উল্লেখিত শাস্ত্রলিপি একইভাবে নতুন নিয়মের প্রতিও প্রযোজ্য। অর্থাৎ, নতুন নিয়মও ঈশ্বর নিঃশ্বসিত বাক্য।

১করি ১৪:৩৭ পদে, পৌল তার লেখাকে ঈশ্বরের বা প্রভুর আজ্ঞা বলে বর্ণনা করেছে। *[* ১করি ৭:১২ পদের সঠিক ব্যাখ্যা— এই পদের প্রকৃত অর্থ বুঝতে হলে, আমাদের প্রথমে ২৫ ও ৪০ পদ দেখতে হবে। ২৫ পদ অনুসারে কুমারীদের বিষয় পার্থিব পরিচর্যাকালে যীশুর দ্বারা উক্ত কোনও কথা পৌলের জানা ছিল না, কিন্তু ১০ পদে বিবাহিতদের বিষয়ে যীশুর পার্থিব কথা পৌলের জানা ছিল। তাই, ১২ পদের অর্থ অবিশ্বাসীনী স্ত্রীর প্রতি আচরণ সম্বন্ধে যীশুর কোনও পার্থিব নির্দেশ না থাকায়, পৌল নিজের নির্দেশের কথা উল্লেখ করেছে। তাই, ১২-১৫ পদে পৌল এইভাবে তার নিজের নৈতিক শিক্ষাকে তুলে ধরেছে। এখন প্রশ্ন হল, পৌল এই অধিকার কোথা থেকে পেল? এ বিষয়ে ২৫ পদে পৌল বিশ্বস্ততার নিমিত্ত প্রভুর দয়াপ্রাপ্ত অন্যান্য লোকের ন্যায় নিজেকে প্রকাশ করেছে। এর অর্থ পৌলের বিচারকে যীশুর ক্ষমতাপূর্ণ বাক্যের সঙ্গে সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য উদাহরণ, যোহন ১৪:২৬, ১৬:১৩;২পিতর ৩:২;১করি ২:১৩;১থিষ: ৪:১৫;প্রকা: ২২:১৮-১৯। *]*

২। বাইবেল পাঠের দ্বারা বাইবেলের দাবী (ঈশ্বরের বাক্য) সম্বন্ধে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায়

বাইবেল যে ঈশ্বরের বাক্য, সে সম্বন্ধে বাইবেলের দাবী এক বিষয়;আবার, সেই দাবীগুলি যে সত্য, সে বিষয় দৃঢ় প্রত্যয় লাভ, আর এক বিষয়। যখন পবিত্র আত্মা এই বাক্যের মধ্যে এবং মাধ্যমে আমাদের হৃদয়ে কথা বলেন এবং আন্তরিক নিশ্চয়তা দেন, তখন বাইবেলের বাক্য যে ঈশ্বরের বাক্য, সে সম্বন্ধে আমরা চূড়ান্ত বিশ্বাস লাভ করতে পারি। পৌল তার শিক্ষাকে পবিত্র আত্মা দ্বারা দেওয়া হয়েছে, এমন এমন কথা বলেছে, ***"প্রাণীক মনুষ্য ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি গ্রহণ করে না, কেননা তাহার কাছে সে মূর্খতা; আর সে সকল জানিতে পারে না, কারণ তাহা আত্মিকভাবে বিচারিত হয়"*** (১করি ২:১৪)। ঈশ্বরের আত্মার কাজ ছাড়া, কেউ কখনও আধ্যাত্মিক সত্য গ্রহণ করতে পারে না, এবং বাইবেল যে ঈশ্বরের বাক্য, তাও গ্রহণ করে না।

কিন্তু যাদের মধ্যে ঈশ্বরের আত্মা কাজ করেন, তাদের মধ্যে এই সত্য সম্বন্ধে সর্বদা স্বীকারোক্তি দেখতে পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিটি সেই বিষয়ের সমান যে, যারা যীশুকে বিশ্বাস করত, তারা জানত যে তাঁর সকল কথা সত্য। যীশু তাই এমন কথা বলেছেন, ***"আমার মেষেরা আমার রব শুনে, আর আমি তাহাদিগকে জানি, এবং তাহারা আমার পশ্চাৎ গমন করে"*** (যোহন ১০:২৭)। যারা খ্রীস্টের মেষ, তারা উত্তম ও মহান মেষপালকের কথা (যা তারা বাইবেল পাঠের দ্বারা লাভ করে), শোনে ও পালন করে;এবং তারা নিশ্চিত হয় যে, এই সকল কথা অবশ্যই তাদের প্রভুর।

একথা স্মরণে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, এই দৃঢ় প্রত্যয় শাস্ত্রের বাক্য ছাড়া আসে না বা শাস্ত্র বাক্যের সঙ্গে অতিরিক্ত সংযোজনের দ্বারাও আসে না। এটা এমন নয় যে, কোনও দিন পবিত্র আত্মা আমাদের কানে ফিসফিস করে বলে, *"তুমি তোমার টেবিলের উপরে বাইবেল দেখতে পাচ্ছ? আমি চাই যেন তুমি জান যে, বাইবেলের বাক্য সকল ঈশ্বরের বাক্য।"* কিন্তু লোকেরা যখন শাস্ত্র পাঠ করে, তাদের সৃষ্টিকর্তা যখন শাস্ত্রের বাক্যের মাধ্যমে তাদের কানে তাঁর রব উপস্থিত করেন, এবং যখন তারা অনুভব করে যে, এই বই আর পাঁচটা বইয়ের মত নয়, তখন তারা বুঝতে পারে যে, এ অবশ্যই তাদের হৃদয়ে কথা বলে এমন ঈশ্বরের নিজের কথা।

৩। অন্যান্য সাক্ষী যদিও প্রয়োজনীয় কিন্তু চূড়ান্ত নয়

আগের আলোচনা কখনও অন্যান্য যুক্তির সত্যকে অস্বীকার করে না। আমরা যখন শিক্ষা করি যে, বাইবেল ঐতিহাসিক দিক থেকে নির্ভুল বা এর শিক্ষা ধারাবাহিক, বা এর ভাববাণী সকল কয়েকশো বছর ধরে পূর্ণ হয়েছে, বা মানুষের ইতিহাস এই বইয়ের দ্বারা সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত হয়েছে, বা লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন এর দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, বা এর মাধ্যমে মানুষরা পরিত্রাণের সন্ধান পেয়ে চলেছে, বা এর মধ্যে মহান সৌন্দর্য এবং শিক্ষার গভীরতা আছে— এ সকলই আমাদের কাছে খুবই সাহায্যকারী। এই সমস্ত যুক্তি আমাদের কাছে খুবই প্রয়োজনীয়, এগুলি আমাদের বিশ্বাসের বাধাকে বিভিন্ন পথে

সরিয়ে দেয়। কিন্তু এ সকল যুক্তির দ্বারা চূড়ান্তভাবে প্রত্যয় লাভ সম্ভব নয়। এই বিষয়ে ওয়েষ্টমিন্ষ্টার বিশ্বাস স্বীকারোক্তি *(Westminster Confession of Faith)* এমন কথা বলে,

> *"আমরা মণ্ডলীর (১৬৪৩-৪৬) সাক্ষ্যের দ্বারা পবিত্র শাস্ত্রের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উপলব্ধি পেতে পারি। আর বিষয়বস্তুর স্বর্গীয় ভাব, মতবাদের সত্য, ভাবধারার প্রগাঢ়তা, প্রতিটি অংশে সম্মতি, . . . সকল শাস্ত্রবাক্যই যে ঈশ্বরের বাক্য, সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়ে থাকে, কিন্তু এ আমাদের শাস্ত্রের সম্পূর্ণ নির্ভুলতা বা ঐশ্বরিক ক্ষমতা সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিশ্চয়তা দিতে পারে না; যা পবিত্র আত্মা আমাদের অন্তরে তাঁর অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যের দ্বারা প্রকাশ করে থাকেন।" (Chap 1, Para 5)*

৪। ঈশ্বরের বাক্য আত্ম-সাক্ষ্য দিয়ে থাকে

এই ভাবে, ঈশ্বরের বাক্য নিজের বিষয় প্রমাণ দেয়। তাই, অন্য কোনও মহত্তর ক্ষমতার কাছে আবেদনের দ্বারা শাস্ত্রকে "ঈশ্বরের বাক্য" হিসাবে প্রমাণ করার কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ শাস্ত্রকে ঈশ্বরের বাক্য হিসাবে প্রমাণ করার জন্য যদি কোনও মহত্তর ক্ষমতার কাছে আবেদন করা হত, তা হলে বাইবেল সর্বোচ্চ বা চরম ক্ষমতার বিষয় হতে পারত না; বাইবেল সেই মহত্তর ক্ষমতার কাছে হীনতর বা তার ক্ষমতার অধীন হয়ে পড়ত। আমরা যদি বাইবেলকে "ঈশ্বরের বাক্য" হিসাবে প্রমাণ করতে মানুষের যুক্তি বা ক্ষমতা বা ঐতিহাসিক সত্য, বা বৈজ্ঞানিক সত্য, প্রভৃতিকে চূড়ান্ত ক্ষমতা দিই, তা হলে আমরা ঐ সকল বিষয়কে ঈশ্বরের বাক্য থেকে বেশী ক্ষমতাযুক্ত এবং বেশী সত্য বা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করব।

৫। এর অর্থ এই নয় যে, শ্রুতিলিপিই *(dictation)* ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র উপায়

এই অধ্যায়ের আগের সকল আলোচনা শাস্ত্রের সকল বাক্যকে ঈশ্বরের বাক্য হিসাবে তুলে ধরেছে। এমন কথা বলার পর একটি সতর্কতার কথা বলা প্রয়োজন। শাস্ত্রের সমস্ত কথা ঈশ্বরের কথা, এই সত্য যেন আমাদের কখনও এমন বিষয় চিন্তা করতে পরিচালিত না করে যে, ঈশ্বর শাস্ত্রের প্রতিটি কথা মানুষ লেখকদের শ্রুতিলিপির *(dictation)* দ্বারা দিয়েছেন।

আমরা যখন বাইবেলের সমস্ত বাক্যকে ঈশ্বরের বাক্য বলি, তখন আমরা শাস্ত্রের অস্তিত্বকে সফল করার পদ্ধতির ফলাফল সম্বন্ধে বলে থাকি। শ্রুতিলিপির প্রশ্ন শাস্ত্রের পূর্ণাঙ্গরূপ ধারণকে নির্দেশ করে বা ঈশ্বর কীভাবে তাঁর ইচ্ছাক্রমে, কীভাবে তাঁর উদ্দেশ্যকে সফল করেছেন, তা নির্দেশ করে। আমরা অবশ্যই স্বীকার করব যে, ঈশ্বর কেবল একটি উপায়ে বা পদ্ধতিতে বাইবেলের মানুষ লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি। চূড়ান্ত ফল পাওয়ার জন্য ঈশ্বর বিভিন্ন পদ্ধতিকে ব্যবহার করেছেন।

শাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানে শ্রুতিলিপির অনেক উদাহরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। যোহন যখন পাটম-দ্বীপে দর্শনের মাধ্যমে জীবিত প্রভুকে দেখেছিল, যীশু যোহনকে এমন কথা বলেছিলেন, ***"ইফিস্থ মণ্ডলীর দূতকে লেখ— যিনি নিজ দক্ষিণ হস্তে সেই সপ্ত তারা ধারণ করেন, যিনি সেই সপ্ত সুবর্ণ দীপবৃক্ষের মধ্যে গমনাগমন করেন, তিনি এই কথা কহেন"*** (প্রকা: ২:১); ***"স্মূর্ণাস্থ মণ্ডলীর দূতকে লেখ"*** (প্রকা: ২:৮) ***"আর পর্গামস্থ মণ্ডলীর দূতকে লেখ"*** (প্রকা: ২:১২)। এগুলি শ্রুতিলিপির নিখুঁত উদাহরণ। পুনরুত্থিত প্রভু যোহনকে কী কী লিখতে হবে, সে বিষয়ে বলেছিলেন, এবং যোহন সেই সকল কথাই লিখেছে।

পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের প্রতিও একই প্রকার ঘটনা ঘটেছে। আমরা পাঠ করি, ***"তখন যিশাইয়ের কাছে সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হল, যাও, হিষ্কিয়কে বল তোমার পিতৃপুরুষ দাউদের সদাপ্রভু এই কথা বলেন, আমি তোমার প্রার্থনা শুনিলাম, আমি তোমার আয়ু পনেরো বৎসর বৃদ্ধি করব, এবং অশূরের রাজার হস্ত হতে আমি তোমাকে ও এই নগরকে উদ্ধার করব, আমি এই নগরের ঢাল-স্বরূপ হব"*** (যিশাইয় ৩৮:৪-৬)। এখানে যিশাইয় ঈশ্বরের কথা শুনেছিল (শারীরিক কান দিয়ে, না তার হৃদয়ের গভীর রেখাপাতের দ্বারা, তা বলা মুশকিল), যা তিনি রাজা হিষ্কিয়কে বলেছিল।

কিন্তু শাস্ত্রের অন্যান্য অংশ অবশ্য এই ধরণের প্রত্যক্ষ শ্রুতিলিপিকে ব্যবহার করে লেখা হয়নি। ইব্রীয় পুস্তকের লেখক বলেছে যে, ঈশ্বর পূর্বকালে ***"বহুভাগে ও বহুরূপে ভাববাদীগণে পিতৃলোকদিগকে কথা বলেছেন"*** (ইব্রীয় ১:১)। অন্যদিকে আমরা লূকের দ্বারা ঐতিহাসিক গবেষণার উপায়কেও দেখতে পাই, ***"প্রথম অবধি যারা স্বচক্ষে দেখেছেন, এবং বাক্যের সেবা করে এসেছেন, তারা আমাদের যেমন সমর্পণ করেছেন, সেইমত অনেকেই আমাদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে***

গৃহীত বিষয়াবলীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হস্তক্ষেপ করেছেন, সেই জন্য আমিও প্রথম থেকে সকল বিষয় সবিশেষ অনুসন্ধান করেছি বলে, হে মহামহিম থিওফিল, আপনাকে আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লেখা বিহিত বুঝলাম, যেন আপনি যে সকল শিক্ষা পেয়েছেন, সেই সকল বিষয়ের নিশ্চয়তা জ্ঞাত হতে পারেন" (লূক ১:১-৩)।

এটা পরিষ্কারভাবে শ্রুতিলিপি নয়। লূক সাধারণ উপায়গুলি, যেমন প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলা এবং ঐতিহাসিক তথ্য সমূহের একত্রীকরণের দ্বারা যীশুর জীবন ও বাণী সম্বন্ধে নির্ভুল বিবরণ লিখেছে। লূক প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ঐতিহাসিক গবেষণা চালিয়েছে— প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য ও যত্নের সঙ্গে তার সত্য বিচারের দ্বারা। তাই তার লেখা সুসমাচার তার চিন্তাকে গুরুত্ব দিয়েছে এবং তার নিজের বৈশিষ্ট্য বা ভাবধারা তার লেখায় ফুটে উঠেছে। তাই, বাইবেল লিপিবদ্ধকরণে ঈশ্বর তাঁর আত্মার দ্বারা যে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, তাকে জৈবিক অনুপ্রেরণা *(organic inspiration)* বলা হয়, তা যান্ত্রিক অনুপ্রেরণা *(mechanical inspiration)* নয়।

সহজ নিখাদ শ্রুতিলিপি এবং ঐতিহাসিক গবেষণা ছাড়াও অন্যান্য উপায়ে শাস্ত্র বাক্য লিখিত হয়েছে। এই সমস্ত বিভিন্ন উপায়গুলি হল: ক) স্বপ্ন, খ) দর্শন, গ) প্রভুর রব শ্রবণ, ঘ) যীশুর সমসাময়িক লোকদের সাক্ষ্য, ঙ) পবিত্র আত্মার দ্বারা স্মরণ (যোহন ১৪:২৬), ইত্যাদি। আবার অনেক ক্ষেত্রে মানুষ লেখকদের কাছে ঈশ্বরের বাক্যের প্রকাশের উপায় সম্বন্ধে কোনও কিছুই বলা হয়নি। আপেক্ষিকভাবে, বিভিন্ন উপায়কে ব্যবহার করা হয়েছিল, কিন্তু প্রত্যেক উপায়কে নির্দিষ্ট ভাবে আবিষ্কার করা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

শাস্ত্রের বেশীরভাগ অংশে মানুষ লেখকের সাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং লেখার ধরণ ফুটে উঠেছে— লেখকের জীবনের উপর ঈশ্বরের তত্ত্বাবধান-মূলক দূরদৃষ্টি এবং পরিচালনা, তাদের ব্যক্তিত্ব, তাদের প্রেক্ষাপট এবং প্রশিক্ষণ, জাগতিক বিভিন্ন বিষয়ের মূল্যায়নে তাদের সক্ষমতা, ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান, তথ্যের সত্যের বিষয় তাদের বিচার, এবং লেখার সময় তাদের নিজেদের পরিস্থিতিকে এমন ভাবে সাজিয়েছিল যে, তারা যখন খাতা ও পেন নিয়ে বাইবেলের বিভিন্ন বই লিখেছে, তখন একদিকে যেমন সেই সকল কথা সম্পূর্ণভাবে তাদের নিজেদের কথা, অপরদিকে তা সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের কথা, যা ঈশ্বর তাদের দ্বারা লিখতে চেয়েছিলেন— তাই ঈশ্বর তাদের লেখা সেই সকল কথাকে নিজের কথা বলে দাবী করেন *[*জৈবিক অনুপ্রেরণা *(organic inspiration)]*।

খ) অতএব শাস্ত্রের কোনও কথার প্রতি অবিশ্বাস বা অবাধ্যতা, ঈশ্বরের প্রতিই অবিশ্বাস বা অবাধ্যতার সমান

উপরে আমরা দেখলাম যে, শাস্ত্রের সকল কথাই ঈশ্বরের কথা। ফলস্বরূপ, শাস্ত্রের কোনও কথার প্রতি অবিশ্বাস বা অবাধ্যতা, ঈশ্বরেরই প্রতি অবাধ্যতা বা অবিশ্বাসের সমান। তাই, পুরাতন নিয়মের প্রতি অবিশ্বাসের নিমিত্ত, যীশু তাঁর শিষ্যদের তিরষ্কার করেছিলেন (লূক ২৪:২৫)। তাই, শিষ্যদের কথা রক্ষা করতে বা বাধ্য হতে বিশ্বাসীদের আজ্ঞা করা হয়েছে— ***"তারা যদি আমার বাক্য পালন করত, তবে তোমাদের বাক্যও পালন করত"*** (যোহন ১৫:২০)। বিশ্বাসীদের তাই ***"প্রেরিতগণের দ্বারা দত্ত প্রভুর আজ্ঞা স্মরণ করতে"*** (২পিতর ৩:২) বলা হয়েছে। পৌলের লেখার প্রতি অবাধ্যতা প্রকাশ করলে, মণ্ডলীর নিয়মের প্রতি অবাধ্যতার ফলস্বরূপ, তাকে মণ্ডলী থেকে বহিঃষ্কার করার কথা পর্যন্ত বলা হয়েছে (২থিষ ৩:১৪)। আবার, আধ্যাত্মিক শাস্তির বিষয়েও উল্লেখ পাওয়া যায় (২করি ১৩:২-৩)। অপর দিকে, যিশাইয় ৬৬:২ পদে প্রভুর বাক্যের প্রতি "কম্পমান" ব্যক্তিতে প্রভুর আনন্দের কথা বলা হয়েছে।

মণ্ডলীর ইতিহাসে সকল শ্রেষ্ঠ প্রচারক নিজের ক্ষমতাকে অস্বীকার করে শাস্ত্র-বাক্যের ব্যাখ্যা এবং শ্রোতাদের জীবনে তার পরিষ্কার প্রয়োগ করেছেন। তাঁদের প্রচার, তাঁদের বা অন্যদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে শক্তিলাভ করেনি, কিন্তু ঈশ্বরের শক্তিশালী বাক্য থেকে শক্তি লাভ করেছে (তাদের নিজেদের ধারণা বা সৃজনশীল চিন্তা বা বাগ্মিতা থেকেও নয়)। তাঁরা ঈশ্বরের মন্দিরের বেদীতে দাঁড়িয়ে এমন কথা বলেছেন: *"এই পদের অর্থ এই। আপনি কি এখানেও এই পদের অর্থ দেখতে পান? তা হলে, আপনাকে আপনার সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাঁর বাক্যের প্রতি, বিশ্বাস ও বাধ্য হতে হবে। কারণ ঈশ্বর স্বয়ং, যিনি আপনার সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু, তিনি আজ আপনাকে এই কথা বলেছেন।"* কেবল লিখিত ঈশ্বরের বাক্য প্রচারকের প্রচারকে এমন চূড়ান্ত ক্ষমতা দিতে পারে।

গ) শাস্ত্রের সত্যপরায়ণতা

১। ঈশ্বর মিথ্যা কথা বলতে পারেন না

বাইবেলের লেখকেরা বার বার বাইবেলের কথাকে, যদিও মানুষের দ্বারা লিখিত বিষয় হিসাবে স্বীকার করে, কিন্তু পাশাপাশি ঈশ্বরের বাক্য হিসাবেও দাবী করে। আমরা বাইবেলের বিশেষ কিছু অংশ থেকে ঈশ্বরের বাক্যের কিছু বৈশিষ্ট্যের বিষয় দেখব এবং সেগুলিকে শাস্ত্রের প্রতিটি বাক্যের প্রতি প্রয়োগ করব। বিশেষতঃ কয়েকটি স্থানে ঈশ্বরের উক্তির সত্যপরায়ণতার কথা বলা হয়েছে। তীত ১:২ পদে ***"মিথ্যা-কথনে অসমর্থ ঈশ্বরের"*** বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু, আমাদের ঈশ্বর মিথ্যা কথনে অসমর্থ, সেইহেতু, তাঁর প্রতিটি কথায় আস্থা স্থাপন করা সম্ভব। আবার, যেহেতু শাস্ত্রের সকল অংশ ঈশ্বরের কথা, সেইহেতু সমস্ত শাস্ত্র সত্য বা মিথ্যা-কথনে অসমর্থ। অর্থাৎ, শাস্ত্রে কোনও মিথ্যা নেই।

ইব্রীয় ৬:১৭-১৮ পদে, দুটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে, যাদের কোনও পরিবর্তন নেই— ঈশ্বরের মন্ত্রণা ও তাঁর প্রতিজ্ঞা। এ বিষয়ে ঈশ্বরকে ***"যাঁর পক্ষে মিথ্যাকথা বলা অসম্ভব"*** হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ঈশ্বর শুধু যে মিথ্যা কথা বলেন না, তা নয়; কিন্তু মিথ্যা কথা বলা ঈশ্বরের পক্ষে অসম্ভব। কেবল মন্ত্রণা (দিব্য) বা প্রতিজ্ঞার বিষয়ে নয়, কোনও বিষয়েই ঈশ্বর মিথ্যা কথা বলতে পারেন না। (আমরা যীশুর তিরষ্কার স্মরণে রাখব— কেবল দিব্য করার সময় সত্য কথা বলা নয়, কিন্তু আমরা সব সময় সত্য কথা বলব, মথি ৫:৩৩-৩৭, ২৩:১৬-২২)। একই ভাবে, দাউদ ঈশ্বরকে বলেছে, ***"তুমিই ঈশ্বর, তোমারই বাক্য সত্য"*** (২শমূয়েল ৭:২৮)।

২। অতএব, শাস্ত্রের সমস্ত বাক্য সম্পূর্ণ সত্য এবং সর্বাংশে নির্ভুল

যেহেতু, বাইবেলের সকল বাক্য ঈশ্বরের বাক্য এবং যেহেতু ঈশ্বর মিথ্যা কথা বলতে পারেন না; সেইহেতু শাস্ত্রের কোনও অংশে কোনও মিথ্যা বা ভুল নেই। বাইবেলের বিভিন্ন অংশ এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয় : ***"সদাপ্রভুর বাক্য সকল নির্ম্মল বাক্য, তাহা মৃত্তিকার মুচিতে খাঁটি করা রৌপ্যের তুল্য, সাতবার পরিষ্কৃত রৌপ্যের তুল্য"*** (গীত ১২:৬)। আবার হিতোপদেশ ৩০:৫ পদে এমন কথা বলা হয়েছে, ***"ঈশ্বরের বাক্য পরীক্ষাসিদ্ধ, তিনি আপনার শরণাপন্ন লোকদের ঢালস্বরূপ।"*** শাস্ত্রের কিছু বাক্য সত্য, এমন নয়, শাস্ত্রের সমস্ত বাক্যই সত্য : ***"অনন্তকালের নিমিত্ত হে সদাপ্রভু, তোমার বাক্য স্বর্গে সংস্থাপিত"*** (গীত ১১৯:৮৯)। যীশুও তাই শাস্ত্রের অনন্তকালীন বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন, ***"আকাশ ও পৃথিবীর লোপ হবে, কিন্তু আমার বাক্যের কখনও লোপ হবে না"*** (মথি ২৪:৩৫)। মানুষের কথার সঙ্গে তাই ঈশ্বরের কথাকে তুলনা করে বলা হয়েছে: ***"ঈশ্বর মনুষ্য নয় যে মিথ্যা বলবেন, তিনি মনুষ্য-সন্তান নয় যে অনুশোচনা করবেন"*** (গণনা ২৩:১৯; গীত ১৯:৭-১০)।

৩। ঈশ্বরের বাক্যই সত্যের চরম মান

যোহন ১৭ অধ্যায়ে যীশু পিতার কাছে প্রার্থনা করেছেন, ***"তাহাদিগকে সত্যে পবিত্র কর, তোমার বাক্যই সত্য স্বরূপ"*** (যোহন ১৭:১৭)। এখানে যীশু ঈশ্বরের বাক্যকে ব্যাখ্যার জন্য বিশেষণের (*En. true; Gk. alethios, alethes*) ব্যবহার করেননি, কিন্তু বিশেষ্যের (*En. truth; Gk. aletheia; "Your Word is truth"*) ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ, ঈশ্বরের বাক্য যে কেবল সত্য *(true)*, তা নয়, কিন্তু তা নিজেই সত্য *(truth)*।

এর থেকে বলা যায় যে, বৃহত্তম বা মহত্তম কোনও মানের সঙ্গে তুলনার দ্বারা বাইবেলকে সত্য বলা যেতে পারে, এমন নয়। কিন্তু বাইবেল নিজেই সকল সত্যের চরম মান। বাইবেল ঈশ্বরের বাক্য, এবং ঈশ্বরের বাক্যই কী সত্য এবং কী সত্য নয়, তার চূড়ান্ত মানদণ্ড । ঈশ্বরের বাক্য নিজে নিজেই সত্য। তাই বাইবেলই সত্যের চরম মান । বাইবেলকেই সত্যের মানদণ্ড হিসাবে ধরে অন্য সকল বিষয়ের সত্যপরায়ণতা যাচাই করতে হবে। অর্থাৎ, যে সকল বিষয় শাস্ত্রের শিক্ষার সঙ্গে এক হবে, তা সত্য; কিন্তু যে সকল বিষয় শাস্ত্রের শিক্ষার বিপরীত, তা মিথ্যা।

তা হলে সত্য কী? ঈশ্বর যা বলেন, তাই সত্য, এবং বাইবেলে আমরা ঈশ্বরের কথা পাই।

৪। নতুন কোনও সত্য কি বাইবেলের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারে?

বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক কোনও আবিষ্কার কি কখনও বাইবেলের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে পারে? আমরা দৃঢ়-প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে পারি যে, এমন ঘটনা কখনও ঘটবে না, এ সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব। আমরা যদি শাস্ত্র-বাক্যের সঠিক উপলব্ধি করে থাকি, তাহলে এমন কোনও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ঘটতেই পারে না, যা শাস্ত্রের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। যেহেতু শাস্ত্রের প্রকৃত লেখক স্বয়ং ঈশ্বর, যিনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত বিষয় জানেন; সেইহেতু তাঁর জ্ঞানের বিপক্ষে কখনও কোনও আবিষ্কার সাধিত হতে পারে না। অর্থাৎ, এমন কোনও বিষয়ের আবির্ভাব অসম্ভব, যা ঈশ্বর আগে থেকে জানতেন না বা যা তিনি শাস্ত্রবাক্য লিপিবদ্ধ করণের সময় চিন্তা করেননি। সকল সত্য বিষয় অনাদি অনন্তকাল ধরে ঈশ্বরে জানেন;তাই, শাস্ত্রের কোন উক্তি সত্য-বিরোধী হতে পারে না।

তবুও আমরা সর্বদা স্মরণে রাখব যে, বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক জ্ঞান আমাদের শাস্ত্রের শিক্ষাকে উপযুক্তভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে থাকে। অনেক সময় আমরা যাকে শাস্ত্রের শিক্ষা বলে মনে করি, বাস্তবিক তা শাস্ত্রের শিক্ষা না-ও হতে পারে। ফলস্বরূপ বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক আবিষ্কার আমাদের শাস্ত্রের সঠিক শিক্ষায় উপনীত হতে সাহায্য করে। যদিও, পৃথিবী সৃষ্টির সময় হিসাবে ৪০০৪ খ্রীস্ট পূর্বাব্দকে শাস্ত্র কোথাও কোনও উল্লেখ করে না, তবুও শাস্ত্রে উল্লেখিত বিভিন্ন বংশাবলী থেকে এমন সন, তারিখ চিন্তা করা হয়েছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, সৌরবিদ্যা বা ভূ-বিদ্যা সংক্রান্ত জ্ঞান বিশ্বাসীদের পৃথিবীর বয়স সম্বন্ধে বাইবেলের শিক্ষাকে পুনরায় চিন্তা করতে বাধ্য করে। আর যত্নসহকারে বাইবেলের শিক্ষাকে উপলব্ধির দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে, বাইবেল পৃথিবী সৃষ্টির সময় সম্বন্ধে কখনও ৪০০৪ খ্রীস্ট পূর্বাব্দকে নির্দেশ করে না।

ঠিক একইভাবে, বাইবেল কখনও এমন শিক্ষা দেয় না যে, সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে। কারণ, শাস্ত্র কেবল আমাদের চোখের দ্বারা অনুভূত প্রাকৃতিক ঘটনার বর্ণনা দিয়ে থাকে। তবুও যখন সৌরজগতের বিভিন্ন তথ্য মানুষের কাছে উৎঘাটিত হয় ও মানুষ জানতে পারে যে, পৃথিবী তার নিজের অক্ষের উপর ঘুরছে, তখন অনেকে বাইবেলের কথাকে ব্যঙ্গ করেছিল। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আমাদের বাইবেলের সত্যের বিশ্লেষণকে পুনরায় বিশ্লেষিত করে। তাই, যখন কোনও আবিষ্কার বাইবেলের সত্যের বিরুদ্ধে শিক্ষা দেয়, তখন আমাদের দায়িত্ব সেই বৈজ্ঞানিক তথ্যের কেবল পুনঃবিবেচনা নয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাইবেলের শিক্ষাকে উপযুক্তভাবে উপলব্ধি করা। আমরা যা মনে করেছি, বাইবেল কি সত্যই তা শিক্ষা দেয়? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা।

তাই, আমরা বিভিন্ন ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে কখনও ভয় করব না। পরিবর্তে আমরা তাদের অনুপ্রাণিত করব। উদাহরণস্বরূপ, সিরিয়ায় প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণার দ্বারা *Ebla* প্রস্তরফলক আবিষ্কৃত হয়। আনুমানিক ২০০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দের এই প্রস্তরফলকের তথ্য আমাদের বিশ্বাসের আদিপিতা অব্রাহাম, ইসহাক বা যাকোবদের বিষয় এবং তাদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে উপলব্ধি করতে বিশেষ সাহায্য করে। খ্রীস্ট বিশ্বাসীরা কি এই আবিষ্কারের বিভিন্ন তথ্যকে জনসমক্ষে প্রকাশ থেকে দূরে থাকবে? এই ভয়ে যে, এই আবিষ্কার আদিপুস্তকের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে? কখনও না। বরং আমরা ঐ আবিষ্কারের তথ্যাদি প্রকাশের বিষয় অনুপ্রেরণা দেব, কারণ ঐ সকল তথ্যের উপযুক্ত উপলব্ধি শাস্ত্রের পক্ষে সাক্ষ্য দেবে এবং শাস্ত্রের নির্ভুলতাকে তুলে ধরবে। কোনও সত্য, শাস্ত্রে ঈশ্বরের বাক্যের সত্যপরায়ণতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে পারে না, কারণ ঈশ্বর সমস্ত সত্য ঘটনা জানেন এবং তিনি কখনও মিথ্যা বলেন না।

ঘ) লিখিত শাস্ত্র-বাক্য আমাদের চূড়ান্ত ক্ষমতার বিষয়

শাস্ত্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা, লিখিত আকারের দ্বারা প্রকাশিত হয়ে থাকে। প্রস্তর-ফলকের উপরে ঈশ্বর যে আজ্ঞা লিখেছিলেন, মোশী তাকে নিয়ম-সিন্দুকের ভেতরে রেখেছিল। পরবর্তীকালে, মোশী ও অন্যান্য ভাববাদীদের ঈশ্বর তাঁর বাক্যকে লিপিবদ্ধ করতে আজ্ঞা করেছিলেন। পৌল এই লিখিত শাস্ত্র *(En. Scripture; Gk. graphe)*-কে ***"ঈশ্বর নিশ্বসিত"*** আখ্যা দিয়েছে (২তীম ৩:১৬)। ঠিক একইভাবে, পৌলের লেখাকে শাস্ত্রের অন্যান্য অংশের সঙ্গে সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে (২পিতর ৩:১৬)।

এ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, অনেক সময় অনেক মানুষ লিখিত শাস্ত্রবাক্য অপেক্ষা অন্যান্য বিষয়কে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, অনেকে এমন কথা বলে থাকেন, আমরা যদি সুসমাচারে যীশুর উক্তিগুলিকে (গ্রীক) অরামিয় ভাষায়

অনুবাদ করি (যে ভাষায় যীশু কথা বলতেন), তবে আমরা যীশুর কথার অর্থকে আরও ভালো করে বুঝতে পারব। এমনকি এমন কথাও বলা হয়ে থাকে যে, এই ভাবে গ্রীক সুসমাচারের অরামিয় অনুবাদের দ্বারা গ্রীক সুসমাচারের সংশোধন করা সম্ভব।

আবার অনেকে এমন কথা বলে থাকেন, *"পৌল যা লিখেছে তার থেকে পৃথক চিন্তা আমাদের জানা আছে-- এবং সেটাই সত্য।"*আবার অনেকে পৌলের ভুল ধরে এমন কথা বলেন, *"পৌল যদি তার চিন্তায় ধারাবাহিকতা বজায় রাখতেন, তা হলে তার এমন কথা বলা উচিত ছিল।"*আবার মণ্ডলীর কোন বিশেষ সমস্যার বিষয় মথির লেখা সুসমাচার থেকে পৃথক নিজের মত প্রচারক প্রকাশও করে থাকেন।

উপরের ঐ সকল ক্ষেত্রে, উক্তি বা পরিস্থিতি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন অবশ্যই আমাদের শাস্ত্র বাক্যের প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে সাহায্য করবে। কিন্তু আমাদের কাল্পনিক উক্তি বা পরিস্থিতির ব্যাখ্যা কখনও শাস্ত্রের চূড়ান্ত সত্যপরায়ণতা বা ক্ষমতার সঙ্গে প্রতিযোগীতার উপযুক্ত নয়। সেই সমস্ত কাল্পনিক উক্তি বা ব্যাখ্যা কখনও যেন শাস্ত্র বাক্যের সত্যপরায়ণতার বিষয় বা নির্ভুলতার বিষয় প্রশ্ন বা সন্দেহ না করে। আমরা সর্বদা স্মরণে রাখব যে, শাস্ত্র বাক্য ঈশ্বরের বাক্য, তাই আমরা যেন কখনও ঈশ্বরের বাক্যকে উন্নততর করার ব্যর্থ চেষ্টা না করি। বরং আমরা শাস্ত্র বাক্যের সঠিক উপলব্ধিতে সচেষ্ট হব, এবং তারপর তাতে আমাদের আস্থা স্থাপন করব এবং আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে তা পালন করব।